ইসলাম ও ভারতবর্ষ

এম. এন. রায়

ইসলাম তার প্রগতিশীল ভূমিকা পালনের পর্ব শেষ করে ভারতবর্ষে আসে। তখন আর আরবের শিক্ষিত, সংস্কৃতিবানরা এর নেতৃত্বে নেই। তা সত্ত্বেও এর পতাকায় সুগ্রথিত ছিল উন্মেষযুগের এবং বিজয়কালীন যৌবনের বৈপ্লবিক নীতিসমূহ। ইতিহাসের ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, পারস্য ও খ্রিস্টান দেশগুলোর মতো ভারতবর্ষেও মুসলিম বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত করে দিয়েছিল একই ধরনের দেশীয় কিছু ঘটনা। যখন কোনো মহান জাতি, যে জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং সুপ্রাচীন সভ্যতা রয়েছে, বিদেশী আক্রমণকারীর কাছে অতি সহজে পদানত হয় তখন বুঝতে হবে, আক্রমণকারীর প্রতি বিজিত জাতির বিপুল জনসাধারণের সক্রিয় না হোক মৌন সম্মতি এবং সহানুভূতি রয়েছে। ব্রাক্ষণ্য গোঁড়ামি বৌদ্ধবিপ্লবের কণ্ঠরোধ করার ফলে প্রচলিত ধর্মবিরোধী অগণিত নির্যাতিত মানুষ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এরাই জানিয়েছিল ইসলামের মতবাদকে সাদর অভ্যর্থনা।

মোহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন ব্রাক্ষণ শাসকদের দ্বারা নিগৃহীত জাঠ ও কৃষিজীবীদের সক্রিয় সহয়োগিতায়। তারপর তিনি অনুসরণ করেন প্রথমদিকের আরব বিজেতাদের রাজ্যশাসন পদ্ধতি। তিনি ব্রাক্ষণদের আস্থায় নিয়ে তাদের উপর দায়িত্ব দেন দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনার। তিনি তাদেরকে মন্দির মেরামত করার সুয়োগ এবং পূর্বের মতো নিজস্ব ধর্ম পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। রাজস্ব সংগ্রহ করার দায়িত্বও দেন তাদের ওপর এবং প্রচলিত পন্থায় স্থানীয় প্রশাসন প্ররিচালনার জন্য তাদেরকেই নিয়োজিত করেন।[১]

ব্রাক্ষণেরা পর্যন্ত-অন্তত তাদের কেউ কেউ যখন যেকোন মূল্যে বিজয়ী ম্লেচ্ছদের দিকে ঝুঁকতে শুরু করলেন তখন দেশের অবস্থা যে খুব স্বাভাবিক ছিল এমন কথা বলা যাবে না। সমাজে এমন বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য বিরাজ করছিল যে, সর্বাধিক সুবিধাভোগী শ্রেণীরও নিরাপত্তা ছিল না। প্রতিবিপ্লবের ফল ওরকমই হয়ে থাকে। বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে বিপ্লব হয়তো দমন করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে বিপ্লবের উৎপত্তি হয়ে থাকে, প্রতিক্রিয়াপন্থী বিজয়ী শক্তি সেই সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ দূর করতে পারে না। ভারতে বৌদ্ধবিপ্লব পরাভূত হয়নি, অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য তা ব্যর্থ হয়েছে।

সেই বিপ্লবকে জয়ের পথে নিয়ে যাবার জন্য ঐ সময়ে সামাজিক শক্তিসমূহ যথেষ্টে পরিপক্ক ছিল না। বৌদ্ধ বিপ্লবের পতন ঘটায় সমগ্র দেশ অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক নিপীড়ন, বুদ্ধিবৃত্তিক নৈরাজ্য এবং আধ্যাত্মিক বিশৃঙ্খলার অতলে ডুবে যায়। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র সমাজ তখন অবক্ষয় ও পচনের এক মর্মান্তিক প্রক্রিয়ার কবলে পড়ে। এটাই হচ্ছে সেই বাস্তবতা, যে পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র নিপীড়িত জনগোষ্ঠী তাৎক্ষণিকভাবে ইসলামের পতাকার নিচে এসে ভিড় করেনি, উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও স্বার্থের খাতিরে বিদেশী আক্রমণকারীদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল। নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে ইসলাম রাজনৈতিক সমানাধিকার না হোক সামাজিক সমানাধিকার দিয়েছিল। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, জনসাধারণ যখন নৈরাশ্যকর অবস্থার মধ্যে পড়ে তখনই উচ্চশ্রেণীর ভেতর নৈতিক আদর্শবিচ্যুতি দেখা দেয়।

হ্যাভেল সাহেব প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির একজন উগ্র সমর্থক। মুসলমানদের প্রতি তার কোনো সহানুভূতি কিংবা উদার মনোভাব ছিল ভুলেও এমন ধারণা পোষণের সুযোগ নেই। অথচ তিনি ভারতবর্ষে ইসলামের প্রসার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এক চমৎকার ও কৌতূহলপ্রদ প্রমাণ হাজির করেছেন, যারাই ইসলাম গ্রহণ করলো তারাই পেলো মুসলিম প্রজার সবরকম আইনগত অধিকার।

আদালতে সব মামলার নিষ্পত্তি হতো কোরআনের বিধি বিধানের আলোকে, আর্য আইন-কানুন দিয়ে নয়। ধর্মান্তরিত করার এই পদ্ধতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিশেষত যেসব অস্পৃশ্য জাতি হিন্দু ধর্মের নির্মম বিধানে নির্যাতিত হচ্ছিল তাদের মধ্যে খুব কার্যকারী হয়।[২]

ব্রাহ্মণ্য বিধি-বিধানের পূর্ণতায় কট্টর বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছ থেকে এমন মন্তব্য মোটেও প্রশংসার নয় স্বীকার করি, তারপরও মুসলিম বিজয়ের সময়ে ভারতবর্ষে এমন বহু ধরনের জনসাধারণ বসবাস করতো, যারা নানাভাবে বিচারবুদ্ধি খাটিয়েও হিন্দু বিধান ও ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রতি কোনোরকমেই আস্থাশীল হতে পারেনি। আর সে কারণেরই যে তারা তাদের পৈতৃক সম্পদ পরিত্যাগ করে ইসলামের অধিকতর পক্ষপাতশূন্য সুষম আইন কানুনের আশ্রয় নিয়েছিল এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। বৌদ্ধদের উপর বিজয়ী হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারের হাত থেকে ভারতের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে ইসলাম সেদিন আশ্রয় দিয়েছিল।

অন্য এক জায়গায় হ্যাভেল সাহেব আরবের নবীর শিক্ষার আধ্যাত্মিক মূল্য ছোট করে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু একই সঙ্গে ভারতে তাঁর শিক্ষা বিস্তার লাভ প্রসঙ্গে তিনি একটি মূল্যবান মন্তব্যও করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামের দর্শন নয়, সামাজিক কর্মসূচীই এত অধিক ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত হতে অনুপ্রাণিত করেছে। এ অবশ্য সত্য কথা যে, সাধারণ মানুষের কাছে দর্শনের কোনো আবেদন থাকার কথা নয়। যে অবস্থায় তারা দিন কাটায় তার চাইতে উন্নততর সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীই তাদেরকে বেশি আকৃষ্ট করে থাকে। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট সামাজিক কর্মসূচীর সঙ্গে নিকৃষ্ট দর্শন তথা জীবনের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।

> যদি ইসলামের সামাজিক কর্মসূচী ভারতের সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ করে থাকে তবে বঝতে হবে, এই কর্মসূচীর পেছনের দর্শনও ছিল হিন্দু দর্শনের চেয়ে শ্রেয়। হিন্দু দর্শনই ভারতীয় সমাজ জীবনে এনেছিল বিশৃঙ্খলা আর ইসলাম সেই বিশৃঙ্খলা থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখায়। উপরোক্ত বিবৃতি দিয়ে হ্যাভেল সাহেব প্রকারান্তরে স্বীকার করেন যে, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ভারতীয়দের মন জয় করার সময়েও ইসলামের বৈপ্লবিক ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আর শুধুমাত্র এই সামাজিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যের কারণেই ভারতের মাটিতে ইসলাম এতোটা দৃঢ়মূল হতে পেরেছে। সত্যের খাতিরে বলতে হয়, ইসলাম তার অবনতির দিনেও হিন্দু রক্ষণশীলতার তুলনায় অধিকতর আত্মিক, আদর্শিক ও সামাজিক প্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে।

হ্যাভেল সাহেব ইন্দো ইউরোপীয় সংস্কৃতির একজন গোঁড়া সমর্থক ও প্রশংসাকারী এবং উক্ত সংস্কৃতিকে তিনি মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার মহত্তম সৃষ্টি বলে মনে করেন। অন্যদিকে তিনি মুসলমানদের দুচোখে দেখতে পারেন না্। হিন্দুদের বিরুদ্ধে যায় বলে তার মতকে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি হিন্দুদের দিকেই ঝোঁকা ছিলেন। সুতরাং তার মত একজন ঐতিহাসিক যদি প্রাচীন ভারতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে দেখে থাকেন তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয় ও বিকাশ লাভের বিষয়টি বাইরের কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এজন্য মূলত দায়ী ছিল আর্যাবর্তের রাজনৈতিক অধঃপতন-যা হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর শুরু হয়েছিল। নবীর সমাজ ব্যবস্থায় সত্যিকার বিশ্বাসীদের সমান আত্মিক মর্যাদা ছিল, ইসলাম রাজনৈতিক ও সামাজিক সমন্বয় সাধন করেছিল, যার লক্ষ্য ছিল জগৎ শাসন করা। জগৎটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হবার জন্য ইসলামী জীবনবিধান যথেষ্ট। বৌদ্ধ দর্শন ও ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির মধ্যে সৃষ্ট সংঘাত যখন উত্তর ভারতে একটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করে সেই সংকটকালে রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে চলে যায় ইসলাম।[৩]

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাজা হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, ভারতের রাজনৈতিক অবক্ষয়ের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ইসলামের উত্থান ঘটেছে। একজন সম্রাটের মৃত্যু তিনি যতোই বড় হন না কেন, ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে না। কয়েক শতাব্দী ধরে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বৌদ্ধ বিপ্লবই একে রেখেছিল কিছুদিনের জন্য থামিয়ে। কিন্তু সে বিপ্লব পরাভূত হওয়ার পর অবক্ষয় আরও ক্ষিপ্র, বেগবান ও সুতীব্র হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসাশ্রম যেমন অন্যত্র করেছিল ঠিক তেমনি বৌদ্ধ মঠের অধঃপতন এবং গোটা ভারতে এর প্রক্ষিপ্ত প্রভাব ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ে প্রভূত সহায়তা করেছিল।

গজনীর মাহমুদ-এর অভিযানের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে হ্যাভেল আরও লিখেছেন, যুদ্ধে তার জয় ছিলো একপ্রকার অবধারিত, যা তার খ্যাতিকে নিয়ে যায় তুঙ্গে আর ইসলামকে নিয়ে যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অমার্জিত সমরপ্রিয় শ্রেণীগুলোর কাছে, যাদের কাছে যুদ্ধই ছিল ধর্ম এবং রণাঙ্গনে জয়লাভ করাই ছিল সর্বোচ্চ অনুপ্রাণিত হওয়ার প্রমাণ।[8]

অনাদিকাল থেকে ভারতীয়রা যে বিশ্বাসে মন্দিরের দেবদেবীর চরণে তাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করে এসেছে মাহমুদের সমরাভিযানে তাদের সেই দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে কুঠারঘাত হানে। ফলে মন্দিরের উপাসনা পদ্ধতিতে যে ধর্মীয় অনুভূতি স্বতঃউৎসারিত হতো এবং তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি যে অগাধ বিশ্বাস ছিল, এই ধাক্কায় তা নড়বড়ে হয়ে যায়। এই অবস্থায় ধর্মানুভূতি ও আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিই জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করে নিষ্ক্রিয় ও অকর্মণ্য দেবতাগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের হৃদয়ের ভক্তি ও ভালোবাসাকে অধিকতর শক্তিশালী ঈশ্বরের আরাধনায় নিবেদন করতে। তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর উপাসনায় জনসাধারণ সেদিন দর্শনীয়ভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। থানেশ্বর, মথুরা ও সোমনাথ প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত মন্দিরগুলোতে যে যে দেবতার পূজা হতো তাদের অলৌকিক শক্তির কথা যুগ যুগ ধরে পূজারীরা বিশ্বাস করে এসেছে। এই শক্তিমান দেবতাদের অলৌকিক ক্ষমতা তাদের নিরাপদ রাখবে-এই আশ্বাসের ছলনায় ভুলিয়ে অসংখ্য সরলবিশ্বাসী জনসাধারণের কাছ থেকে মন্দিরের পরোহিতরা প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন এই বিধর্মী আক্রমণকারীর প্রবল আঘাতে এতদিনের ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের কাঠামো তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে। মাহমুদের সেনাদল এগিয়ে এলে এসব মন্দিরের পরোহিতরা লোকদের বলেছে যে, দেবতার রুদ্ররোষে আক্রমণকারী বিহিনী ভস্মীভূত হয়ে যাবে। অলৌকিক কিছু ঘটে কি না তা দেখার জন্য লোকেরা ঐকান্তিক বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে সাফল্য আক্রমণকারীর ঈশ্বরেরই অনুকূলে ছিল। বিশ্বাস যদি অলৌকিক ঘটনার উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে যেদিকে অলৌকিকত্বের জোর বেশি সেদিকেই বিশ্বাস মোড় নিবে-এটাই স্বাভাবিক। ধর্মীয় ঐতিহ্যের মানদণ্ডে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যারা সেই সংকট সন্ধিক্ষণে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারাই ছিলেন সবার চেয়ে বড় ধার্মিক।

মুসলমানদের ভারত বিজয়ের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ কারণের অনুসন্ধান ও সুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের আজও ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। একজন গোঁড়া হিন্দু, যে তার প্রতিবেশী মুসলমানকে ছোটলোক মনে করে, এই অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ তার সেই বদ্ধমূল ধারণা দূর করে দেবে। আর বদ্ধমূল ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারলেই হিন্দু সম্প্রদায় ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ের গঠনমূলক পরিণতির কথা অনুধাবন করতে পারবে। বিজয়ীর প্রতি বিজিতের ঘৃণা দূর করতে সেটাই হবে সহায়ক। মার্জিত মেজাজ ও অতীত ইতিহাস মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা আমূল পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসন আশা করা যায় না। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসজনিত বিশৃঙ্খলা থেকে ভারতীয় সমাজকে বাঁচিয়ে দিতে মুসলমানদের অবদানকে হিন্দুরা যতদিন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি না করবে, ততদিন মুসলমানরা যে ভারতীয় জাতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এ বিশ্বাস তাদের কিছুতেই হবে না। অধিকন্তু, ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন যে সার্থক-এই সঠিক ধারণা নিয়ে ইতিহাসকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলে আমরা বর্তমান দুর্ভাগ্যের সুগভীর কারণগুলো সনাক্ত ও দূর করতে সক্ষম হতাম।

অন্যদিকে ইতিহাসের নাট্যমঞ্চে ইসলাম যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে আমাদের কালের অত্যন্ত কম সংখ্যক মুসলমানই সেকথা জানে। কোনআনের শিক্ষাবহির্ভূত বলে আরবদের যুক্তি ও সংশয়বাদকে অনেকেই অস্বীকার ও পরিহার করতে পারে, কিন্তু তারপরও ইতিহাসে ইসলাম একটা অবিস্মরণীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। আরব দার্শনিকদের প্রাথমিক অবিশ্বাস ও অধার্মিকতার দ্বারা তা যতটা সম্ভব হয়েছে পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়াপন্থী আলেমদের সমৃদ্ধিতে কিংবা ধর্মন্তরিত বর্বর তাতারদের গোঁড়ামিতে তা হয়নি। ভারতবর্ষে আসার আগেই ইসলাম তার প্রগতিশীল ভূমিকা পালনের পর্ব শেষ করে ফেলে। সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে ইসলামের পতাকা বিপ্লবী মরুবীররা প্রোথিত করেনি; করেছে ইসলামে দীক্ষিত মধ্য এশিয়ার বর্বরেরা আর বিলাসিতায় নীতিচ্যুত পারস্যবাসীরা। মোহাম্মদ (সঃ)- এর স্মৃতি বিজড়িত দৃষ্টিনন্দন আরব সাম্রাজ্যকে এরা উভয়ে করেছে বিপর্যস্ত। তবুও ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ বিপ্লব যখন পর্যুদস্ত, ভারতীয় সমাজ বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত, তখন অগণিত জনসাধারণ আশা ও মুক্তির প্রত্যাশা নিয়ে ইসলামকে জানায় সাদর সম্ভাষণ। কি পারস্যবাসী, কি ভারত বিজেতা মোগল-কেউই আরব মরুবীরদের মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা ও উদারতা থেকে নিজেদের একেবারে দূরে সরিয়ে রাখেনি। দূরদেশের লুটেরা আক্রমণকারীর অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দল দীর্ঘকাল ধরে এই বিরাট দেশের শাসক হয়ে বসায় এবং লক্ষ লক্ষ লোক তাদের স্বভাববিরোধী বিশ্বাস গ্রহণ করায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় সমাজের বাস্তব প্রয়োজন বহুলাংশে মেটাতে তারা সক্ষম হয়েছিল।

> এমনকি প্রতিক্রিয়ার ফলে তার আদি বিপ্লবাত্মক উত্তাপের অনেকটা হ্রাস পাওয়ার পরও ইসলাম হিন্দু সমাজে তার অনেক বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। আক্রমণকারীদের শক্তির উৎকর্ষের দ্বারা ভারতবর্ষে মুসলিম শক্তি সংহত হয়নি, মুসলিম শক্তি সংহত হয়েছে ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল আইন-কানুনের প্রচার ও প্রয়োগে।

এমনকি ভয়ঙ্কর রকমের উগ্র, মুসলিমবিদ্বেষী হ্যাভেল সাহেবও নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেছেন যে, হিন্দু সমাজ জীবনে, মুসলিম রাজনৈতিক মতবাদের ফল ফলেছে দু রকমে-জাতিভেদের গোঁড়ামিকে এ যেমন একদিকে শক্ত করেছে, তেমনি

অপরদিকে তার বিরুদ্ধেও সৃষ্টি করেছে এক বিদ্রোহ। হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গের চোখের সামনে এঁকেছে এক আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যতের ছবি, মরুভূমির বেদুইনদের মতো তারাও তাতে আকৃষ্ট হয়েছে। শূদ্রকে দিয়েছে মুক্ত মানুষের অধিকার আর ব্রাহ্মণদের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা। ইউরোপের পুনর্জাগরণের মতো চিন্তাজগতে তুলেছে তরঙ্গাভিঘাত, জন্ম দিয়েছে অগণিত দৃঢ় চরিত্র মানুষের আর বহু বিস্ময়কর মৌলিক প্রতিভার। নবজাগৃতির আদর্শের মতো এও ছিল প্রধানত এক নাগরিক আদর্শ। এই আদর্শের টানে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে যাযাবরকে এবং শূদ্রকে ত্যাগ করতে হয়েছে তার গ্রাম। মোটের উপর, এই আদর্শের ভিত্তিতে বিকশিত হয়েছিল এক ধরনের মানবতা, যা ছিল বাঁচার আনন্দে পরিপূর্ণ।[৫]

উপরের এই আলোকসম্পাতকারী মন্তব্যের সঙ্গে শুধু এটুকু যোগ করলেই চলে যে, মুসলিম বিজয়ের ফলে সমাজদেহে যে ধাক্কা লেগেছিল তাতেই সম্ভব হয়েছিল কবীর, নানক, তুকারাম ও চৈতন্য প্রমুখ সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব। আর অনেকটা সেজন্যই তাঁরা ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বহুজন সমর্থিত একটা বিপ্লবও দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইতিহাস পড়লে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি হিন্দুদের উন্নাসিক আচরণ অযৌক্তিক মনে হবে। অবজ্ঞার মনোভাবই ইতিহাসকে অপমানিত করেছে আর ক্ষতি সাধন করেছে দেশের ভবিষ্যতের। মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার অধিনায়ক হয়েছে। এমনকি আজও তার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা অতীত ঋণের কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন না। দুর্ভাগ্যের কথা, ইসলামী সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থেকে ভারতবর্ষ পরোপুরি উপকৃত হতে পারেনি। কারণ, সেই সম্মানের অধিকারী হবার যোগ্যতা তার ছিল না। বিলম্বে হলেও এখনও নব জাগরণের সৃষ্টি বেদনায় কাতর হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ মাত্রই মানবেতিহাসের সেই অবিস্মরণীয় অধ্যায় থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে লাভবান হতে পারেন। মানব সংস্কৃতিতে ইসলামের অবদান সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সেই অবদানের ঐতিহাসিক মূল্যের যথার্থ উপলব্ধি হিন্দুদের উদ্ধত আত্মতুষ্টি ও অহংবোধের ওপর প্রচন্ড অভিঘাত হানতে বাধ্য। আর সমকালীন মুসলিম মনের সংকীর্ণতার প্রতিকার চাইলে তারা যে ধর্মের অনুসারী বলে নিজেদের দাবি করে সেই ধর্মের প্রকৃত মর্মবাণীর মুখোমুখি এনে তাদেরকে দাঁড় করাতে হবে।

[১] এলিয়ট, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া

[২] ই.বি হ্যাভেল, এরিয়ান রুল ইন ইন্ডিয়া

[৩] ই.বি হ্যাভেল, এরিয়ান রুল ইন ইন্ডিয়া

[৪] ই.বি হ্যাভেল, এরিয়ান রুল ইন ইন্ডিয়া

[৫] ই.বি হ্যাভেল, এরিয়ান রুল ইন ইন্ডিয়া

সুত্রঃ বিবা প্রকাশনী প্রকাশিত ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রন্থ

এম. এন. রায়